প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সার্কুলার ইকোনমি

মুশফিকুর রহমান

৫ জুন ২০২৩ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও উদযাপিত হলো 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'। এবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের জন্য প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল 'প্লাস্টিক দূষণের সমাধানে সামিল হই সকলে' এবং স্লোগান ছিল 'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ'। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য এবং স্লোগানে সকলকে নিয়ে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশ্বজুড়ে প্লাস্টিক পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার বেড়ে চলার সাথে সাথে দূষণের ভার বাড়ছে। প্লাস্টিক এবং পলিথিন পণ্য স্বল্প মূল্য, ব্যবহার উপযোগিতা এবং সহজ লভ্যতার কারণে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। ব্যবহৃত প্লাস্টিক এবং পলিথিন (বিশেষত একবার ব্যবহার উপযোগী প্লাস্টিক ও পলিথিন) পরিবেশে বর্জ্য হিসেবে নিক্ষেপিত হচ্ছে কোনো বাছ-বিচার ছাড়াই।

কার্যত, প্রায় অপচনশীল প্লাস্টিক বর্জ্য এখন কেবল নগরীর দূষণ উপাদান হিসেবে সমস্যা নয়; প্লাস্টিক বর্জ্যের বিস্তৃতি জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে পড়ছে। প্লাস্টিক বর্জ্য আমাদের মাটি, বাতাস এবং পানির পরিবেশে অবস্থিত জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। প্লাস্টিক দূষণের ভয়াবহতা, ব্যাপ্তি নিয়ে বিশ্বজুড়ে এখন এক ধরনের স্বীকারোক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আলোচনায় আইনানুগ বাধ্যবাধকতা পূরণের অঙ্গীকারের মধ্যে প্লাস্টিক দূষণকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলছে। গত বছর ২৯ মে-২ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ সমাবেশেও বিশ্বের ৬৭ দেশের প্রতিনিধিগণ প্লাস্টিক দূষণ সমস্যা সমাধানে ২০২৫ এর মধ্যে আইনি বাধ্যবাধকতার 'বৈশ্বিক প্লাস্টিক চুক্তি' প্রণয়নে আলোচনা করেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের হিসেবে দেশে প্রতিবছর প্রায় ৮,২১,২৫০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে ঢাকা নগরীর প্রতিদিনের উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ প্রায় ৬৮১ টন। সারাদেশে গড়ে প্রতিবছরে মাথাপ্রতি প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ৯ কেজি; ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে মাথাপ্রতি গড় প্রায় ১৮ কেজি। বাংলাদেশে প্লাস্টিক বর্জ্যের প্রায় ৪০% রিসাইকেল বা পুনঃচক্রায়ন সম্ভব হয়। অবশিষ্ট ৬০% প্লাস্টিক বর্জ্য ভাগাড়ে বা জলাধার-নদীতে নিক্ষেপিত হয়।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ প্লাস্টিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেবার চেষ্টা করছে। ২১ জুন ২০২১ তারিখে সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১২ জেলার ৪০ উপজেলায় একবার ব্যবহার উপযোগী প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে ৩ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় সরকার 'মাল্টিসেক্টরাল অ্যাকশন প্লান ফর সাসটেইনেবল প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এই কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২৬ সালের মধ্যে দেশে ৯০% 'একবার ব্যবহার উপযোগী প্লাস্টিক' ব্যবহার বন্ধ করা, ২০৩০ সালের মধ্যে প্লাস্টিক উৎপাদনে ৫০% 'ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল' ব্যবহার হ্রাস করা, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% প্লাস্টিক বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন নিশ্চিত করা, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে সরকার ইতিমধ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ কার্যকর করেছে। এই বিধিমালায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মৌলিক নীতি অনুসরণ করে বর্জ্য হতে সম্পদ পুনরুদ্ধার করবার প্রচেষ্টা হিসেবে উৎস হতে বর্জ্যের চূড়ান্ত পরিত্যাজনের পূর্বে প্রত্যাখ্যান, বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার, পুনঃক্রায়ন, পুনরুদ্ধার, পরিশোধন এবং অবশিষ্টাংশের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

বিধিমালায় অন্যান্যের মধ্যে পরিত্যাজ্য বর্জ্য জৈব পচনশীল ব্যাগে বা মোড়কে পরিত্যাজনের আবশ্যিকতা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া প্লাস্টিক উৎপাদক, আমদানিকারক, ব্রান্ড ওনার্সদের জন্য বর্ধিত দায়দায়িত্ব বা এক্সটেনডেড প্রডিউসার্স রেসপনসিবিলিটি (ইপিআর) নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের পরিবেশ নীতিতে সামুদ্রিক প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে জোর দেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 'রিডিউস, রি-ইউজ, রি-সাইকেল' বা '৩ আর' নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় দেশে 'সার্কুলার ইকোনমি' প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।

উৎপাদন ব্যবস্থায় আমরা সচরাচর সরল রেখার মতো পর্যায়ক্রম অনুসরণ করে পরিবেশ থেকে সংগৃহীত কাঁচামালকে চূড়ান্ত ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করাকে বুঝি। এরপর ব্যবহৃত পণ্য পরিবেশে বর্জ্য হিসেবে পরিত্যাগ করা হবে বলেই আমরা ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অনুসরণ অব্যাহত রাখলে একপর্যায়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার উপযোগী কাঁচামাল শেষ হবার ঝুঁকি তৈরি হয়। পরিবেশে বর্জ্যের পাহাড় জমে। তাতে দূষণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যয় বাড়ে ।

'সার্কুলার ইকোনমি'র ধারণা গড়ে উঠেছে সম্পদকে বারবার দক্ষতার সাথে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে মূল্য সৃষ্টি এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে। এতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সীমিত সম্পদের দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবহারকে উৎসাহিত করা, বর্জ্যের পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে সীমিত রাখা, পুরানো পণ্য, বর্জ্য বলে বিবেচিত উপাদান সমূহকে পুনঃচক্রায়ন এবং পুনঃব্যবহার করার মধ্য দিয়ে নতুন পণ্য উৎপাদনের প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হয়।

পরিবেশবান্ধব 'সার্কুলার ইকোনমি'র পথ অনুসরণে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। মানুষের মজ্জাগত অনেক ধারণা, অভ্যাস এবং বিদ্যমান উৎপাদন কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। তবে উৎপাদন এবং ভোগের সাথে বর্জ্য সম্পর্কে মানুষের প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন করা গেলে সার্কুলার ইকোনমি কেবল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সহজ করবে না, আমাদের অবিরাম বেড়ে চলা চাহিদার জোগান দিতে নানামুখী উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ নিয়ে আশংকার অবসান ঘটাবে। সে ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনের পরিবেশ ব্যয় হ্রাস পাবে এবং তা টেকসই হবে। আশা করা অমূলক হবে না যে প্লাস্টিকের মতো 'বহুযুগ স্থায়ী' বর্জ্যও 'সার্কুলার ইকোনমি'র কল্যাণে টেকসই সম্পদে রূপান্তরিত হবে।